প্রকৃতি-স্থিতি-উন্নয়নঃ প্রসঙ্গ ‘আরণ্যক’

সৌম্য ভট্টাচার্য

সত্যান্বেষণ আর অনুসন্ধিৎসা যে প্রচলিত সামাজিক স্থিতাবস্থাকে, ব্যক্তিগত শান্তি স্বস্তিকে নষ্ট করে দেয় এমনকি ব্যক্তিজীবনেও চূড়ান্ত ট্র্যাজেডির নির্মাণ করতে পারে সাহিত্য পাঠকের তা অজানা নয়। অবশ্য তার জন্য সত্যান্বেষণে কোন খামতির সম্ভাবনা বিশেষ একটা দেখা যায়না। যদি ‘সত্য’ কি বা আদৌ তার কোন অস্তিত্ব থাকা সম্ভব কিনা, তা তর্কাতীত নয়। চারপাশের প্রাত্যহিকতায় প্রত্যক্ষদৃষ্টকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করার যে দাওয়াই বাতলেছিলেন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকেরা, তাদের দেখানো পথকেই আপাতত যদি সত্যান্বেষণ বলে ধরে নেওয়া যায়, তবে সেই চেষ্টায় চলিত স্থিতাবস্থা লঙ্ঘিত হওয়ার সম্ভাবনাও যে সুপ্ত থাকে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। যা কিছু প্রত্যক্ষ, ভীষণভাবে স্পষ্ট তা-ই যে সবসময় ‘সত্য’ নয়, এ বিষয়ে দলমত নির্বিশেষে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের নানা দর্শন-প্রস্থান প্রায় একমত। ‘সত্য’ কোন অজর, অক্ষয় ‘বস্তু’ নয়, তারও নির্মাণ সম্ভব; ‘সত্য’ নির্মাণের এই সম্ভাবনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে মানুষের কাছে একটি সংশয়হীন অবস্থান। যুদ্ধ পরবর্তী সাহিত্য কোনো বিশেষ চিহ্ন বা চিহ্নগুচ্ছকে নিজের মধ্যে বহন করে কিনা কিংবা যদি বহন করে তাদের স্বরূপলক্ষণই বা কি, এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ করার অবকাশ এখানে নেই। তবু একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর অন্যান্য ভৌগোলিক অংশের মতো তৎকালীন বাংলাদেশেও মানুষের ‘বিশ্বাস’ নামক বোধটিকে ধাক্কা দিতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও উনিশ শতকে ইউরোপ পরিচিত হয়েছে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে। এই ঘটনার কিছুদিন আগেও যে কাজ করতে অনেক সংখ্যক মানুষের শ্রম নিয়োজিত হতো, যে কাজ ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল তথা সময়সাপেক্ষ, তাকে তুলনামূলক অনেক কম পরিশ্রমে, তুলনামূলক কম ব্যয়ে এবং তুলনামূলক কম সময়ে করা সম্ভবপর হল। সমপরিমাণ শ্রম, পুঁজি এবং সময় ব্যয় করে আগের থেকে অনেক বেশি উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছিল, অর্থাৎ মুনাফার পরিমাণও বাড়তে বাড়তে প্রায় আকাশছোঁয়া। মানুষের মানবিক, সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি অতিরিক্ত মুনাফার খোঁজে আরো বেশি সংকুচিত হতে শুরু করেছে সেই সময় থেকেই। পারা - না পারার সাধারণ বৃত্ত সম্বন্ধে সাধারণ সামাজিক ধারণার আমূল পরিবর্তনের সূচনা সেই থেকেই; আর সেই বৃত্তের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলকে বেঁধে রাখার প্রয়াসের সমাপ্তি বোধহয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। এই বিশেষ প্রেক্ষাপটকে সঙ্গে নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের চলাচল আরম্ভ।

১৯২৯ এ 'পথের পাঁচালি' বার হওয়ার বছর ছয়েক আগেই বাঙালি কল্লোলের[১] সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সকলেই জানেন, মূলত রবীন্দ্রবিরোধিতাকে পুঁজি করে এই গোষ্ঠীর যাত্রা শুরু হলেও এই কালপর্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় এদেরকে যে তীব্র ভাবে নাড়া দিয়েছিল তা ধরা আছে বুদ্ধদেব বসুর 'অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে। তাঁর বক্তব্যটি সরাসরি তুলে দেওয়া গেল - ''অতি- আধুনিক সাহিত্যকে post-war সাহিত্য বললে ভুল হয় না। আধুনিক লেখকেরা সকলেই post-war সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ভিতর দিয়ে বড় হয়ে উঠেছেন। লড়াইয়ের ফলে ইউরোপের যে দুরবস্থা ও মানুষের চিন্তা জগতে যতটা পরিবর্তন এসেছে, আমাদের দেশে তার চেয়ে অনেক কম হলেও উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় আমাদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ ও মনের ভাবধারার গতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। ... বর্তমানে যে বাংলা দেশে জীবন সংগ্রামে যে কঠোর প্রতিযোগিতা চলেছে তাকে মুখের গ্রাস নিয়ে কাড়াকাড়ি বললে অত্যুক্তি হয় না। দারিদ্র্যের তান্ডব নৃত্যের নিষ্ঠুর পদাঘাতে কোথায় উড়ে যাচ্ছে ধর্ম, সমাজ, স্বাস্থ্য, আনন্দ, আয়ু, ইহকাল-পরকালে .. সব । .. যৌথ পরিবার প্রথা ভেঙ্গে পড়েছে- আত্মনির্ভর হবার চেষ্টা সবার মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। বাহ্যিক অবস্থার ওলোট-পালোট হলে চিন্তা জগতেও কিছুনা কিছু বিপ্লব আসতে বাধ্য। বর্তমান বাঙালীর চিন্তা ধারার বর্ণনা করতে গেলে এককথায় বলা যেতে পারে যে তথ্যের সম্পূর্ণ disillusionment এসে গেছে। আমরা মোটের উপর অনেক বেশি rational হয়েছি। অন্ধ ভক্তির উপর আমাদের আর আস্থা নেই; আমরা বিশ্বাস করতে শিখেছি বিজ্ঞানকে। ভগবান, ভূত ও ভালবাসা-এ তিনটি জিনিসের উপর আমাদের প্রাক্তন বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।'' [২] এই আত্মসমীক্ষামূলক বক্তব্য থেকেই এই পর্বের অনেকখানি সত্য পরিচয় পাঠক পেয়ে যাবেন বলেই আমাদের ধারণা।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর সংশয়, অস্থিরতা এবং নেতিবাদী জীবনদৃষ্টি - আশ্রিত কথাসাহিত্য চর্চার মধ্যে বিভূতিভূষণ যখন 'পথের পাঁচালী' নিয়ে দাঁড়ালেন, পাঠক স্বাভাবিকভাবেই বেশ খানিক চমকে উঠেছিল। কাহিনি পরিকল্পনা বা পরিবেশ একান্ত পরিচিত, অত্যন্ত সাধারণ এবং একেবারে বাহুল্য বর্জিত। আপাতদৃষ্টিতে অনেকক্ষেত্রে বৈচিত্র্যহীন, নিতান্ত মামুলি এই প্রেক্ষাপট তার আগেই বহু ব্যবহারে জীর্ণ। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৮৭) থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র এবং সমসাময়িক অন্যান্য লেখকের রচনায় 'প্রকৃতি' একটি বিষয় হিসাবে বিভিন্নভাবে এসেছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে আরো একবার গ্রামবাংলা এবং সেখানে বসবাসকারী অতি সাধারণ মানুষগুলিকে সাহিত্যে কারবার করার

জন্য বিভূতিভূষণ বেছে নিলেন কেন? বহু ব্যবহারে ক্রমশ ক্লিশে হয়ে আসা বিষয়কে আশ্রয় করে কোনো কথাসাহিত্যিক তাঁর জীবনের প্রথম উপন্যাস লেখার এই ঝুঁকিটি নেন কোন প্রত্যয় থেকে? এই প্রশ্নগুলিকে সঙ্গী করেই চলুন 'আরণ্যক'-এর দিকে তাকানো যাক।

বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে প্রচলিত সমালোচনার ধারায় তাঁকে প্রকৃতিবাদী, রোম্যান্টিক পল্লী কথাকার বলে দেগে নেওয়ার সম্পর্কে অল্পবিস্তর প্রত্যেকেই জানেন। 'কল্লোল' (১৯২৩) পরবর্তী বিক্ষুব্ধ সময়ের প্রেক্ষাপটে আরণ্যকের মতের উপন্যাস কি নিছক নাগরিক চোখে পল্লীদর্শন? সমালোচক হয়তো আরণ্যকের প্রস্তাবনা অংশকে সামনে রেখে এর স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করবেন। যেখানে ''সমস্ত দিন আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে গড়ের মাঠে ফোর্টের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া'' কথক সত্যচরণের ''বাদাম গাছের সামনে ফোর্টের পরিখার ঢেউ খেলানো জমিটা দেখিয়া হঠাৎ মনে হলই যেন লবটুলিয়ার উত্তর সীমানায় সরস্বতী কুন্ডীর ধারে সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া আছি।'' যদিও ''পরক্ষণেই পলাশী গেটের পথে মোটর হর্ণের আওয়াজে সে ভ্রম ঘুচিল।'' ব্যস্ত শহরের বুকে কলম পিষে দিনান্তে অবকাশের সময় নিসর্গযাপন কি রোম্যান্টিক মধ্যবিত্ত সুলভ নয়? এই অংশেই তো সত্যচরণের জবানিতে রয়েছে ফেলে আসা বন্য সৌন্দর্যের স্মৃতি যাকে সে ''বুঝি কোনো অবসর দিনের শেষে সন্ধ্যায় ঘুমের ঘোরে এক সৌন্দর্য ভরা জগতের স্বপ্ন'' বলেই মনে করতে চেয়েছে। প্রসঙ্গত পাঠকের মাথায় নিশ্চিতভাবে পাক খাবে তেলেনাপোতার [৩] সেই বিখ্যাত ন্যারেটিভ, যেখানে আপনি অনেকটা এই জাতীয় সান্ধ্যকালীন তন্দ্রামগ্নতার আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুরেও আসতে পারেন তেলেনাপোতা, যদিও শেষমেশ তার ঐহিক অস্তিত্ব নিয়ে আপনি সন্দিহান হবেন, সেই স্মৃতি ক্রমশ 'স্বপ্ন' বলেই মনে হতে থাকবে। কিন্তু, 'আরণ্যক' তেলেনাপোতা নয়।

একথা ঠিক, কেন্দ্র থেকে প্রান্তকে দেখা বা কিছু সময়ের জন্য সেই প্রান্ত জীবনযাপনের মধ্যে রোম্যান্টিক আবিলতার অবকাশ থেকেই যায়। বস্তুত সত্যচরণ কখনোই তার নিজের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেনি। আবার কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে কর্মসূত্রে প্রান্ত জীবনযাপনের সময় তাই তাঁর মধ্যে একই সঙ্গে যুক্ত-বিযুক্তের বোধ জাগরুক থেকেছে। কিন্তু আরণ্যক উপন্যাসটিকে যদি একটি উপস্থিতের বিকল্প প্রস্তাব[৪] হিসাবে পাঠ করা যায় তাহলে বোধহয় কেবল নাগরিক নিসর্গ দর্শনের ভাবনাটি মান্যতা পায় না। উপন্যাসের শুরু থেকেই প্রকৃতির অসাধারণ আনুপুঙ্খিক বর্ণনা পাঠককে মুগ্ধ করলেও ''আমার এ স্মৃতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল,

বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কোনোদিন ক্ষমা করবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়। তাই এই কাহিনীর অবতারণা।'' সত্যচরণের এই স্বীকারক্তি আমাদের খানিক চিন্তার মধ্যে ফেলে দেয়। কেন্দ্র থেকে প্রেরিত প্রতিনিধির সাধারণত অপরাধবোধের অবকাশ কোথায়? কেনই বা সেই অপরাধবোধ স্খলনের জন্য এতগুলি শব্দ খরচের প্রয়োজন হয়। নগর কলকাতার মধ্যবিত্ত পাঠকের কাছে পশ্চিমের রুক্ষ, উষর প্রকৃতির অপরূপ মহিমা কীর্তনের ক্ষেত্রে কী বা এমন অপরাধ রয়েছে? না, প্রকৃতির বর্ণনায় অপরাধ নেই, নিশ্চিত। কিন্তু ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত সত্যচরণ কেবল প্রকৃতি বর্ণনার জন্য পশ্চিমে যায়নি। পশ্চিমের জঙ্গলমহলের হাজার হাজার বিঘে জমি বিলি বন্দোবস্ত করার মধ্যে কেন্দ্রের আধিপত্যবাদ স্পষ্ট। সত্যচরণ সেই আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে একজন ক্রিয়াশীল অণুঘটক, আরো স্পষ্টভাবে বললে এজেন্ট। প্রকৃতির উপরে যার যত বেশি দখলদারি, সমাজের ক্ষমতাস্তম্ভে সে তত বেশি শক্তিশালী। এই ঘটনা নতুন নয়। সভ্যতার প্রাক্ লগ্ন থেকেই ক্ষমতার মানদন্ড বিচারে প্রকৃতি মাপক হিসাবে ব্যবহৃত। কিন্তু শিল্পবিপ্লব পরবর্তী অধ্যায়ে দখলদারির কাঠামোটিতে পরিবর্তন হয়েছে। এনলাইটেনমেন্ট বা আলোকপর্বের যুক্তিকাঠামোকে অস্ত্র বানিয়ে সারা দুনিয়ায় কলোনি কায়েম করেছে ইউরোপ, চাহিদা আরো বেশি মুনাফা। আলোকপর্বের যুক্তিকাঠামো তাই দখলদারির সংজ্ঞাকে আরো পুষ্ট করেছে। ব্রিটিশ কলোনি ভারতবর্ষে সেই যুক্তি কাঠামোতেই সত্যচরণদের জন্ম, বড় হয়ে ওঠা, 'শিক্ষিত' হয়ে ওঠা। কলোনির মুনাফাকে সুসংহত করতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবতারণা, ফল কলোনির মধ্যে আরো অণু-কলোনির জন্ম। 'আরণ্যক' সেই দখলদারির ইতিহাসকে বিবৃত করে। সেই বিকল্প ইতিহাসের পাঠ পড়লে বিভূতিভূষণকে আর নিছক নিসর্গ সৌন্দর্য নির্মাণের কারিগর বলে মনে হয়না, বরং ভীষণভাবে একজন বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আধুনিক লেখক বলেই মনে হয়, যিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই সচেতনভাবে তথাকথিত উন্নয়নের প্রকল্পকে নাকচ করছেন।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন তৈরি হয় শিল্পবিপ্লব পরবর্তী সময়ে এই উন্নয়ন বা প্রগতির বিপ্রতীপ অবস্থান নেওয়ার প্রয়োজন হলো কেন? সভ্যতার স্বাভাবিক নিয়মেই তো উন্নয়ন তার নিজের মতো করে সময়োপযোগী রূপ নিয়ে হাজির হয়। তাতে উপস্থিতের পরিবর্তন সাধনও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বলেই ধরা হয়। কি এমন বিশেষ প্রয়োজন পড়ল যেখানে বিশ শতকের বিশ-তিরিশের দশকে বসে আকাঁড়া যথাস্থিতবাদকে আরো নির্মমভাবে প্রকাশের প্রবণতার পথে না হেঁটে বিভূতিভূষণ একটি বিকল্প ইতিহাস লেখার ঝুঁকি নিলেন? এবং প্রায় নাকচ করলেন আলোকপর্বজাত উন্নয়নের প্রস্তাবিত কাঠামোকে। লেখক বিভূতিভূষণের এই প্রকল্প বিশ্লেষণের আগে একটি তথ্যের দিকে আমরা পাঠককে

নজর দিতে অনুরোধ করব। পাঠক দয়া করে ভাববেন কি যে 'আরণ্যক' উপন্যাসের খলনায়ক বা ভিলেন চরিত্রটি কে? বা কারা? সত্যচরণ গেছেন আধিপত্য বিস্তারের কাজের তদারকি করতে। পরিচিত হয়েছেন কুন্তা, নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া, সরল মহাজন ধাওতাল সাহু, দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজু পাঁড়ে, গনোরি তিওয়ারি থেকে শুরু করে দেশীয় সভ্যতার আদিম প্রত্নচিহ্ন বহনকারী রাজা দোবরু পান্না বীরবর্দী, রাজকুমারী ভানুমতীর মতো বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে। কিন্তু আপনি কিছুতেই এই চরিত্রগুলিকে কেন্দ্রের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করাতে পারবেন না। কারণ এরা ভীষণ অসহায় - ঐতিহাসিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে। ফলে এদেরকে ভিলেন হিসাবে প্রতিপন্ন করার কোনো অবকাশই নেই। আলোকপর্বজাত শিক্ষায় শিক্ষিত সত্যচরণ এই সব প্রান্তবাসীদের জীবনের গল্প পাঠককে শোনালেও শেষ পর্যন্ত সে এই আগ্রাসনের অভিমুখ নির্ধারণের একজন নির্ণায়ক প্রতিনিধি। যদিও এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে তার প্রতি মুহূর্তে যুক্ত-বিযুক্তের সমান্তরাল ক্রিয়াশীল বোধ তাকেও ভিলেন হিসাবে প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আসলে 'আরণ্যকে' কোনো ভিলেন নেই বলেই আমাদের ধারণা। একদিকে তথাকথিত উন্নয়নের সর্বগ্রাসী ভূমিকা, অন্যদিকে উপস্থিতের বিশালতা-এই দুয়ের মাঝে বিভূতিভূষণ নাগরিক পাঠককে দাঁড় করাতে চেয়েছেন। আরো সুনির্দিষ্ট ভাবে বললে তিনি মানুষকে আরেকবার মানুষের সামনেই দাঁড় করাতে চেয়েছেন। সম্ভবত এই কারণেই যথাস্থিতবাদের প্রকাশভঙ্গিকে গ্রহণ না করে অপরাধবোধজাত বেদনাই লেখকের কাম্য। আধুনিক মানুষের মধ্যে এই বেদনা বিরল নয়। বিভিন্ন কারণে ধ্বংসপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হলেও সকলেই যে শেষ পর্যন্ত সেই প্রক্রিয়ার যুক্তি কাঠামোকে আশ্রয় করবেন কিংবা সেই যুক্তি কাঠামোকে প্রায় বিশ্বাসে পরিণত করবেন এমনটা না হওয়াই স্বাভাবিক। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ আধুনিক মানুষের সেই বেদনাজাত যন্ত্রণাবোধকে আরো বেশি পুষ্ট করেছে বৈকি। তার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে বিশ্বের নানা সাহিত্যে, সিনেমায়, গানে, কবিতায়। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিক থেকে যুদ্ধে নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিক সমাজে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধির পিছনে সেই যন্ত্রণাবোধের ভূমিকা কম নয়। এই উপন্যাসে উন্নয়নের স্বরূপলক্ষণ নগ্নভাবে উন্মোচন করার মধ্য দিয়ে আধুনিকের সেই বেদনাজাত যন্ত্রণাই ক্রিয়াশীল থেকেছে। পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন যদি বিভূতিভূষণের এই উন্নয়ন প্রকল্পনা এত ভীষণভাবে অপছন্দ হয় তাহলে বিভূতিভূষণ কি কোনো বিকল্প পথের সন্ধান দিচ্ছেন? সত্যচরণ তো শেষ পর্যন্ত একরাশ ক্ষোভ আর গলায় আটকে থাকা একদলা গ্লানিবোধ নিয়ে শেষপর্যন্ত কেন্দ্রেই ফিরে আসছে। কেন্দ্র-প্রান্ত-কেন্দ্র এই বৃত্তে চলাচল

সম্পূর্ণ করে পুনরায় কেন্দ্রে বসেই প্রান্ত-স্মৃতির পুনর্নির্মাণ ছাড়া সত্যচরনের আর বিশেষ কোনো সক্রিয়তা চোখে পড়ে কি? এর উত্তর খোঁজার আগে একটি বিষয়ে আমরা পাঠকের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে চাই যে সত্যচরণ কোনো বিকল্প পথের সন্ধান দিতে পারেননি। সত্যচরণের বর্ণনা থেকে যদি কেউ বিকল্পের সন্ধান করতে যান তাহলে তা শেষমেশ নিতান্ত ধোঁয়াশা ছাড়া আর কোনো ধারণা পাবে বলে আমাদের মনে হয়না। কারণ সত্যচরণ কোনো বিকল্প দিতে চাননা। সত্যচরণের মতো চরিত্রেরা বিকল্পের সন্ধানে ব্রতী হতেই পারেন, কিন্তু না হলে তাকে আমরা দোষ দিতেও পারিনা যে। কারণ বিকল্প পথের সন্ধান বা নির্মাণে যুক্ত থাকার দায় কিন্তু বিভূতিভূষণের নেই। আরো একটি বিষয় এখানে বলে রাখা ভালো যে কেন্দ্র থেকে প্রান্তে গিয়ে ফের কেন্দ্রে ফিরে আসা সত্যচরণের যাতায়াত পথটিকে একটি সরল বৃত্তের সঙ্গে তুলনা করাটাও বোধহয় ঠিক নয়। কারণ যে বোধ নিয়ে সত্যচরণ প্রান্ত অভিমুখী হয়েছিল আর গড়ের মাঠে ফিরে এসে যে সত্যচরণ নাগরিক পাঠকের সামনে প্রান্ত নির্মাণ করবেন তাদের দুজনের মধ্যে কিন্তু আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকলেও বোধের হেরফের হয়ে গিয়েছে। প্রান্তে পৌঁছে যে সত্যচরণের প্রাণ প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রে ফেরার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল, প্রান্তের নিসর্গকে যে সত্যচরণ জাপানি চিত্রকর হাকুসাই-এর অপূর্ব তৈলচিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন সেই সত্যচরণ আর গড়ের মাঠে বসে আক্ষেপ, গ্লানি, হতাশা তথা বেদনায় প্রতিমূহূর্তে নিয়ত ভাঙতে থাকা, ডুবতে থাকা সত্যচরণ এক মানুষ নন। আধুনিকতার চিহ্নকে বহন করার যে যন্ত্রণা রয়েছে সেই যন্ত্রণা চিহ্ন সত্যচরণের প্রতিটি আচরণে তখন স্পষ্ট। 'প্রকৃতি'- কে বিষয় হিসাবে ব্যবহার করে আধুনিকের নির্মাণে ব্রতী হওয়ার এই প্রয়াস বিভূতিভূষণের একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিকেই আরো একবার সুস্পষ্ট করে, অন্যদের থেকে তাঁর স্বাতন্ত্রকে চিহ্নিত করে।

তথ্যসূত্রঃ

১. 'কল্লোল' সাহিত্য পত্রিকা, প্রথম প্রকাশ ১৯২৩।

২. গোপিকানাথ রায়চৌধুরি, দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তীকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, পৃঃ ১২২

৩. 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', প্রেমেন্দ্র মিত্র।

৪. 'আরণ্যক' একটি বহুচর্চিত উপন্যাস। ফলত এর পাঠ সংক্রান্ত যে সমস্ত আলাচনাগুলি পাওয়া যায় সেগুলিকে 'উপস্থিত পাঠ' হিসেবে ধরে আমাদের নিবন্ধে তার একটি বিকল্প পাঠ নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই প্রসঙ্গেই 'উপস্থিতের বিকল্প পাঠ' শব্দগুচ্ছের ব্যবহার।

বিশেষ উল্লেখ ঃ নিবন্ধে 'আরণ্যক' থেকে ব্যবহৃত প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিগুলি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আরণ্যক', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ত্রয়োদশ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৭ থেকে গৃহীত।